দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও ফল প্রকাশে নগ্ন হস্তক্ষেপ

দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রফিকুল ইসলাম সবুজ ঃ যেনতেনভাবেই বিরোধী পক্ষকে হেস্তনেস্ত করে একক দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং ফলাফল প্রকাশে নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমনকি নিজদলীয় শিক্ষক-কন্যাকে শিক্ষক বানানোর প্রয়াসে আইন লঙ্ঘন করে প্রথম শ্রেণী দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। সরকার সমর্থক শিক্ষরা এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আওয়ামী লীগের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত করার নানাবিধ নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এমএ শেষবর্ষ গ্রুপ-বি পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয় ১৭ জুন, ২০০০। ফলাফল প্রকাশের আগেই একজন ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে তার কন্যার ফলাফল পৌছে যায়। 'অতি গোপনীয়' এ সংবাদটি পাওয়ার পরদিন ১৮ জুন ওই ছাত্রীর পিত আওয়ামীপন্থী হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান আকন ভিসির কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ২ শিক্ষক প্রতিহিংসাবশত তার কন্যাকে কম নাম্বার দেয়ার কারণে সে প্রথম শ্রেণী থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, 'অপ্রকাশিত অতি গোপনীয়' ফলাফল প্রফেসর আকন পেলেন কিভাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিজদলীয় শিক্ষকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এ ব্যাপারে ভিসি বিষয়টি পরীক্ষা কমিটিকে না জানিয়ে বা যাচাই-বাছাই না করেই অথবা আইনের তোয়াক্কা না করেই শুধু অভিযোগপত্র প্রাপ্তির সাথে সাথেই তদন্ত কমিটি গঠন করায় অভিজ্ঞ মহল যেমন বিস্মিত হয়েছে, তেমনি ভিসির নিরপেক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং আইনজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভিসি'র এই তদন্ত কমিটি গঠনের পিছনের কারণ হিসেবে রয়েছে, সরকার বিরোধী শিক্ষকদের চরিত্র হনন, হেস্তনেস্ত করার মাধ্যমে সরকারপন্থীদের একক প্রাধান্য বিস্তার। এ লক্ষ্যেই অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, কলা অনুষদের ডীন এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী শিক্ষক গ্রুপের আহবায়ক প্রফেসর ডঃ মোখলেছুর রহমান এবং জিয়া পরিষদের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক সোহরাব উদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে। ভিসির রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত তদন্ত কমিটি দায়সারা গোছের একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতেই নিছক ক্ষমতার জোরে উক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদন্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে কেউই ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন না। তারপরও তারা তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন ওই শিক্ষকদ্বয় কম নম্বর দিতে পারেন বলে তাদের কাছে মনে হয়েছে। তাদের এই বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে বিস্ময় ও প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুই শিক্ষকের মূল্যায়নকৃত দুটি খাতা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা তৃতীয়বারের মত মূল্যায়ন করা হয়। যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ভলিউম-১, পৃষ্ঠা-১৪৪, অনুচ্ছেদ ডি-১৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'দুজন শিক্ষকের প্রদেয় নম্বর শতকরা ২০ ভাগ বা তার অধিক হলেই কেবলমাত্র তৃতীয় পরীক্ষক দিয়ে তা পুনঃপরীক্ষা করা যেতে পারে।' তবে এক্ষেত্রে পুনঃপরীক্ষা যে করতেই হবে তা আইনে সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতা নেই।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, তৃতীয়পত্রের প্রথম পরীক্ষক দিয়েছেন ৬৩ নম্বর, দ্বিতীয় পরীক্ষক অভিযুক্ত সোহরাব উদ্দিন আহমদ দিয়েছেন ৪৭ নম্বর। বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় পরীক্ষক দিয়েছেন ৪৯ নম্বর। অন্যদিকে চতুর্থপত্রে প্রথম পরীক্ষক প্রফেসর মোখলেছুর রহমান দিয়েছেন ৪৮ নম্বর, দ্বিতীয় পরীক্ষক ৬৪ এবং বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় পরীক্ষক দিয়েছেন ৫২ নম্বর। এখান থেকে দেখা যায় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ উভয়পত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের নম্বরের পার্থক্য ১৬। আইন অনুযায়ী শতকরা ২০ নম্বর পার্থক্য হয়নি। সুতরাং তৃতীয় পরীক্ষক আইনের দৃষ্টিতে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উপরোক্ত নম্বরের পরিসংখ্যান থেকে আরও দেখা যায় যে, উক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কম নম্বর দেয়ার যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে তাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় পরীক্ষকের (যদিও তা বেআইনী) প্রদত্ত নম্বর দুইটি অভিযুক্ত শিক্ষকদ্বয়ের প্রদেয় নম্বরের অতি নিকটবর্তী। এ ক্ষেত্রে এই ২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষপতিত্বের অভিযোগ সম্পূর্ণই অমূলক ও ভিত্তিহীন। যুক্তির খাতিরে যদি তৃতীয় পরীক্ষকের নম্বর গ্রহণযোগ্য হয়েই থাকে তবে আইন অনুযায়ী নিকটবর্তী দুটি নম্বরের গড় নিয়েই ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত শিক্ষদ্বয়ের নম্বরের সাথে তৃতীয় পরীক্ষকের নম্বরের গড় করেই ফলাফল প্রস্তুত করতে হবে। পক্ষপাতিত্বের কারণে যদি কাউকে শাস্তি দিতেই হয়, তবে সে শাস্তি অধিক নম্বর দেয়া ২ শিক্ষকেরই তা প্রাপ্য বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। এই দুই শিক্ষকের অস্বাভিবর্ভাবে অধিক নম্বর দেয়ার বিষয়টি রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল বিস্ময় প্রকাশ ও হতবাক হয়েছেন যে, অভিযুক্ত শিক্ষকদ্বয়ের দেয়া তৃতীয় ও চতুর্থপত্রের নম্বর বাতিল করে বাইরের শিক্ষকের দেয়া নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছে। এরই ফলে আওয়ামীপন্থী ওই শিক্ষক-কন্যার কাঁটায় কাঁটায় সমান নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণী হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ওই দুই শিক্ষকের দুটিপত্রের লিখিত নম্বর বাতিল করা হলেও মৌখিক বাতিল করা হয়নি। কারণ হিসাবে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বাতিল করা হলে ওই ছাত্রীর প্রথম শ্রেণী হত না।

একই যাত্রায় দ্বৈত ফল

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের ১৯৯৯ সালের প্রথমবর্ষ অনার্সের একটি পত্রে মোট পরীক্ষার্থীর শতকরা ৫২ ভাগের উত্তরপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের মধ্যে দেয়া নম্বর শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি হলে পরীক্ষা কমিটি ছাত্রদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ওই উত্তরপত্রগুলো পুনঃপরীক্ষার জন্য বর্তমান ভিসি'র কাছে সুপারিশ করে। কিন্তু ভিসি আইনের দোহাই দিয়ে এই সুপারিশ নাকচ করে দেন। অথচ নিজদলীয় স্বার্থে শুধু একজন পরীক্ষার্থীকে প্রথম শ্রেণী দেয়ার জন্য সে আইনকেই পদদলিত করে এক তুঘলকি কাণ্ডের সৃষ্টি করেছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত ফলাফল বৈধভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।